# سورة الصف

# সূরা সাফ্ফ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৪ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوْٓا
اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَاِذْ
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّ
قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي
اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۗ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ
وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর। (৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে), তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (অতএব, তাঁর প্রত্যেক আদেশ মেনে নেওয়া জরুরী। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই সূরা অবতরণের কারণ এই যে, একবার কয়েকজন মুসলমান পরস্পরে আলোচনা করল যে, আমরা যদি এমন কোন আমল জানতে পারি, যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাস্তবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান পলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দুরূহ মনে করেছিল। সূরা নিসায় এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরশাদ নাযিল হল ঃ) মু'মিন-গণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্থাৎ সীসা গালানো প্রাচীর যেমন মজবুত, অপরাজেয় হয়ে থাকে, তেমনি তারা শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপদ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, বল, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি যদি আমরা জানতাম! শুনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নাযিল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দুরূহ মনে করেছিলে এবং ওহুদ যুদ্ধে কেন পলায়ন করেছিলে? এসব বিষয় সত্ত্বেও বড় বড় দাবী করা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অশোভনীয় ও অপছন্দনীয়। অতএব,

আয়াতে বৃথা আস্ফালন ও মিথ্যা দাবীর কারণে শাসানো হয়েছে। আমলবিহীন উপদেশ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর কাফিররা যে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ্য পাত্র, এর কারণ অর্থাৎ রসূলকে কষ্টদান, মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মিল রেখে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছেঃ স্মরণ কর) যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। (তাঁর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই সব ঘটনার সারমর্ম)। অতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলম্বন করল (এবং সুপথে এল না) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে (আরও বেশী) বক্র করে দিলেন। (অর্থাৎ নাফরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল। সদাসর্বদা পাপ করলে আল্লাহ্র প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা হ্রাস পাওয়াই নিয়ম)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি। তারাও আল্লাহ্র রসূলকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কষ্ট প্রদান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপাচার আরও বেড়ে যায়। এখন সংশোধনের আর আশা নেই। অতএব, তাদের অনিষ্ট দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপযুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে সে সময়টিও স্মরণীয়) যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বললঃ হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সুসংবাদ যে ঈসা (আ) থেকে বর্ণিত আছে, তা স্বয়ং খৃস্টানদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেমতে খাযেনে আবূ দাউ-দের রেওয়ায়েতক্রমে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, বাস্তবিকই হযরত ঈসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নাজ্জাশী খৃস্টধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিতও ছিলেন। খাযেনেই তিরমিযী থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুণাবলী উল্লিখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ঈসা (আ) তাঁর সাথে সমাধিস্থ হবেন। ঈসা (আ) তওরাতের প্রচারক ছিলেন, তাই এটা যেন ঈসা (আ) থেকেই বর্ণিত আছে। মাওলানা রহমতুল্লাহ্ সাহেব 'এযহারুল হকে' তওরাতের বর্তমান কপি থেকে একাধিক সুসংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৪ পৃ. কনস্টান্টিনোপলে মুদ্রিত) বর্তমান ইঞ্জীলে এসব বিষয়বস্তু না থাকা মোটেই ক্ষতিকর নয়; কারণ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদের মতে বর্তমান ইঞ্জীল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে ইউহান্নার ইঞ্জীলের (যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়,) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছেঃ আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, আমি না গেলে 'ফারকিলিত' তোমা-দের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাকে তোমাদের কাছে পঠিয়ে দেব। 'ফারকিলিত' শব্দটি 'আহমদেরই' অনুবাদ। কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত। ঈসা (আ) হিব্রু ভাষায় আহমদ বলেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিরকলুতূস' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহুল প্রশংসিত, খুব

প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই 'ফারকিলিত' করে দেওয়া হল। হিব্রু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত 'আহমদ' নাম বিদ্যমান রয়েছে। এই 'ফারকিলিত' সম্পর্কে ইউহান্নার ইঞ্জীলে বলা হয়েছে ঃ তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সততা ও ন্যায়বিচারের খেলাফ করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র পয়গম্বর হবেন।---(তফসীরে-হাক্কানী) মোটকথা, ঈসা (আ) তাদেরকে উপরোক্ত কথা বললেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্তু বলে নিজের নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য) সে অর্থাৎ ঈসা (আ)) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রমাণ ও মো'জেযা সম্পর্কে) বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। [তারা যাদু বলে নবুয়ত অস্বীকার করল। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর পর আবার বর্তমান কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করল। এটা মহা অন্যায় ও জুলুম। এই জুলুমের সংক্রমণ রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে। বাস্তবিকই] যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, তা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তা অস্বীকার করা---উভয়ই আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলার শামিল। وَهُوَ يُدْعَىٰ বলায় কাজটি আরও বেশী মন্দ হওয়া বোঝা যায়। অর্থাৎ সতর্ক করার পরও সে নিজে সতর্ক হয়নি। وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى বলায় বোঝা যায় যে, তাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই যুদ্ধের শাস্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অস্বীকৃতি বাহ্যত নৈরাশ্যের আলামত। এখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, সত্যের প্রাধান্য ও মিথ্যার পরাজয় সম্পর্কিত ওয়াদা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো (অর্থাৎ ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ কর্মগত কৌশলের সাথে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক কথাবার্তা এই উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসার লাভ করতে না পারে। মাঝে মাঝে মৌখিক প্রোপাগাণ্ডাও কার্যকর হয়ে যায়। অথবা এটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়)। অথচ আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করে ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর রসূলকে (আলো পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য ধর্ম দিয়ে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (আলোরূপ ইসলামকে অবশিষ্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই পূর্ণতা দান করা) যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**শানে-নুযূল ঃ** তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি, আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (র) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্য জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সাফ্‌ফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মু'মিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ

لَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ — সাহাবায়ে কিরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাঁদের হুঁশিয়ার করার জন্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে

হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইন্‌শাআল্লাহ্‌সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কবীরা গোনাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মকরূহ্‌।

**দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য ঃ** উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না ; তা করার দাবী করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কোরআন বলে ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ —অর্থাৎ তোমরা মানুষকে তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও ওয়ায উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ত্রুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তওফীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ্‌ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে অনুতাপ করাও মোস্তাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ—

অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁর

বাণী সমুন্নত করার জন্য কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা গলানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক. তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি ; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব এটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আ)-র শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা (আ)-র শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নামঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ — বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্মদ। আমাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ নাম ছিল।

**ইঞ্জীলে রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ ঃ** একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদী ও খৃস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে,এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ভিত্তিতে আজকালকার খৃস্টানরা কোরআনের

এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইঞ্জীলে কোথাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ্' কেরানভীর কিতাব 'এযহারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খৃস্টধর্মের স্বরূপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুসংবাদ ইঞ্জীলে বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নযীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দু অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَ
مَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝١٢ وَأُخْرَىٰ
تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝١٣ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ
فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ۝١٤

(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ

**করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(প্রথমে জিহাদের পরকালীন ফলাফল ও পরে ইহকালীন ফলাফলের ওয়াদা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (এরূপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বসবাসের উদ্যানে (নির্মিত) হবে। এটা মহাসাফল্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফলাফল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকালীন) ফলাফল আছে, যা তোমরা (বিশেষভাবে) পছন্দ কর (অর্থাৎ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে দ্রুত ফলাফল কামনা করে। হে পয়গম্বর, আপনি) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গের কাহিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছেঃ] মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে)। যেমন [ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল। তখন বহু সংখ্যক লোক ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল]। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী। সে মতে তারা দীন প্রচারে চেষ্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অতঃপর (এই চেষ্টার পর) বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। (এরপর তাদের মধ্যে শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অথবা ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে) অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। (তোমরাও এমনিভাবে দীনে মুহাম্মদীর জন্য চেষ্টা ও জিহাদ কর। উপরোক্ত গৃহযুদ্ধের

সূচনা যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে এতে খৃস্টধর্মে জিহাদের অস্তিত্ব জরুরী হয় না )।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধনসম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লা-হ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়াম-তেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ — শব্দটি أُخْرَى -نعمت

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে قريب শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قريب ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খায়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّونَهَا অর্থাৎ তোমরা এই নগদ নিয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ—

حواريين শব্দটি حوارى -এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা ( আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حوارى বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলের একটি ঘটনা

উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যের জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেনঃ

مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্‌র দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহাবায়ে কিরাম এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নযীর স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও দীনের খাতিরে সারা বিশ্বের শত্রুতা বরণ করে নেন, অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শত্রুদেশ তাঁদের করতলগত হয় এবং তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ ٥ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ -

**খৃস্টানদের তিন দলঃ** বগভী (র) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খৃস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন না বরং আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্য কথা বলল। তারা বললঃ তিনি আল্লাহ্‌ও ছিলেন না, আল্লাহ্‌র পুত্রও ছিলেন না বরং আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হিফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মু'মিন দল যুক্তিপ্রমাণের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। ---(মাযহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ঈসা (আ)-র উম্মতের মু'মিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে।---(মাযহারী) কেউ কেউ বলেনঃ ঈসা (আ)-র আসমানে উত্থিত হওয়ার পর

খৃস্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিশুদ্ধ ও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। ---(রূহুল-মা'আনী) উপরে তফসী-রের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত যুদ্ধের সূচনা কাফির খৃস্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মু'মিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

---